 প্রবন্ধাবলি, খণ্ড : ১১, জুলাই ২০১৯, ৯১-১০২

ধর্মনিরপেক্ষতার স্বরূপ ও বাস্তবতা : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ

মোহাম্মদ হুমায়ুন কবির[১]

সারসংক্ষেপ

ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের সমার্থক হলো যুক্তিবাদ, বিজ্ঞানবাদ এবং মনুষ্যত্ববাদ। পাশ্চাত্যে এই ধারণার উদ্ভব ঘটলেও দক্ষিণ এশিয়া তথা বাংলা অঞ্চলে এ ধারায় চর্চা সুপ্রাচীন। হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতির মূলসুর ছিল মনুষ্যত্ববাদ, যেখানে দ্বিধাহীনচিত্তে উচ্চারণ করা হয়েছিল 'সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপর নাই'। দীর্ঘদিনের বিদেশী শাসন, বঞ্চনা এবং আন্তঃরাষ্ট্রিক উপনিবেশ থেকে মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে যখন বাংলাদেশ রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়, তখন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান রাষ্ট্র পরিচালনার অন্যতম মূলনীতি হিসেবে গ্রহণ করেন ধর্মনিরপেক্ষতাকে। কিন্তু তাঁর এ ধর্মনিরপেক্ষতা পাশ্চাত্যের ধর্মবিযুক্ততার সমর্থক না হয়ে প্রাচ্যদেশী ধর্মীয় সমন্বয়কে সমর্থন করেছিল। তিনি ধর্মকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার নিষিদ্ধ করতে চেয়েছিলেন। বর্তমান বাংলাদেশের বাস্তবতায় সে উদ্দেশ্য কতটুকু পূরণ হয়েছে, তা একটি জটিল প্রশ্ন। আলোচ্য প্রবন্ধে ধর্মনিরপেক্ষতার পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যদেশীয় (দক্ষিণ এশীয়) স্বরূপ কী, বাংলাদেশ কোন প্রেক্ষাপট ও বাস্তবতায় ধর্মনিরপেক্ষতাকে নীতি হিসেবে গ্রহণ করেছিল, দীর্ঘদিনের সামরিক শাসনে রাজনীতিতে ধর্মের যথেষ্ট ব্যবহারের ফলে যে বাস্তবতা দাঁড়িয়েছে, তাতে করে বর্তমান সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতা ও রাষ্ট্রধর্ম একই সাথে স্থান করে নেয়ায় ধর্মনিরপেক্ষ নীতির যৌক্তিকতা ও ভবিষ্যৎ কী, তা খোঁজার চেষ্টা করা হয়েছে।

মূল শব্দ: ধর্মনিরপেক্ষতা, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, ধর্মীয় রাজনীতি, বাংলাদেশ।

ইংরেজি Secularism শব্দের বাংলা অর্থ করা হয় ধর্মনিরপেক্ষতা, ধর্মবিযুক্ততা, ইহজাগতিকতা, জড়-জাগতিকতা ইত্যাদি। *Oxford Dictionary*-তে Secularism-এর অর্থ The belief that laws, education, etc. should be based on facts, science, etc. rather than religion (Oxford Dirtionary, 1995: 1062)। 'ধর্মনিরপেক্ষতা' মানে হলো রাষ্ট্র বা রাজতন্ত্র থেকে ধর্মকে পৃথক করা। এ নীতিতে ধর্মীয় রীতি-নীতি বা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের উপর নির্ভর না করে রাষ্ট্র পরিচালনার নীতিকে বোঝানো হয়। রাষ্ট্র তার আইন প্রণয়নে কোনো বিশেষ ধর্মের উপর নির্ভরশীল হবে না এবং কোনো বিশেষ ধর্মের প্রতি পক্ষপাতমূলক আচরণ করবে না। অর্থাৎ রাষ্ট্র তার নীতি ও আদর্শে ধর্মের ব্যাপারে নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করবে। তবে Secularism শব্দের অর্থ ও তাৎপর্য

[১] অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; ইমেইল : mhumayunkabir@du.ac.bd

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে ভিন্ন রকম। পাশ্চাত্যে এ শব্দ দিয়ে রাষ্ট্রের সাথে ধর্মের একটি দেয়াল সৃষ্টি করাকে বোঝানো হয়। অর্থাৎ রাষ্ট্র ও গীর্জার মধ্যে একটি পৃথকীকরণ সীমারেখা তৈরিকে বোঝানো হয়। কিন্তু প্রাচ্যে বিশেষ করে দক্ষিণ এশিয়ায় ধর্মনিরপেক্ষতা দিয়ে রাষ্ট্রের সাথে ধর্মের একটি সমন্বয় বা সকল ধর্মের প্রতি সমদৃষ্টি/সমমর্যাদা প্রদানের বিষয়টিকে বোঝানো হয়। এক্ষেত্রে রাষ্ট্র নাগরিকদের সকল ধর্মের প্রতি সমান পৃষ্ঠপোষকতা, কোনো বিশেষ ধর্মীয় সম্প্রদায়কে বিশেষ সুবিধা প্রদান না করা বা কোনো ধর্মীয় সম্প্রদায়ের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ না করাকে বোঝানো হয়।

ধর্মের সাথে রাষ্ট্রীয় সম্পর্কের যে ইতিহাস, তা-ও প্রাচ্য ও প্রাশ্চাত্যে ভিন্ন। মধ্যযুগে এক ধর্মের অনুসারীদের সাথে অন্য ধর্মের অনুসারীদের সংঘাত ও সংঘর্ষ, এমনকি একই ধর্মের অনুসারীদের বিভিন্ন উপদলের মধ্যে ও রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ সাধারণ ব্যাপার ছিল। প্রাচীন যুগ থেকে শুরু হওয়া রাজা বা রাষ্ট্রের সাথে ধর্মের সংঘাত মধ্যযুগে এসে তীব্রতর হয়। রাষ্ট্রশক্তি চেয়েছে ধর্মীয় গোষ্ঠীকে নিয়ন্ত্রণ করতে আর ধর্মীয় শ্রেণি চেয়েছে রাষ্ট্রের উপর নিয়ন্ত্রণ। এ সংঘাত ও সংঘর্ষ চলমান থেকেছে। এরূপ অবস্থায় রাজা নিজেই কখনও কখনও ধর্মের কর্তৃত্ব তার হাতে তুলে নিয়েছে। আবার রাজা দুর্বল হলে ধর্মীয় গোষ্ঠী রাষ্ট্রশক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করেছে। মধ্যযুগের শেষ দিকে ইউরোপীয় রেঁনেসাসের ফলে ধর্ম ও রাজতন্ত্রের সাথে বিজ্ঞান ও দর্শনের বিরোধ বাধে। জনগণ ধর্ম ও রাজতন্ত্র উৎখাত করে জনগণের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে। এরই ফলে ফ্রান্সে ফরাশি বিপ্লব সংঘটিত হয়। এ বিপ্লবের শুরুতেই ২৬ আগস্ট ১৭৮৯ সালে ফরাশি জাতীয় পরিষদে (The French National Assembly) নাগরিক ও মানুষের অধিকারের ঘোষণাপত্র (The Declaration of the Rights of Man and the Citizen) -এ বলা হয় যে 'No one shall be molested for his opinions, even religious, provided their manifestation does not disturb the public order establish by law *(La Documentation Francaise)'*। পরবর্তীকালে ১৯৫৮ সালের ফরাশি সংবিধানের প্রস্তাবনায় এ ঘোষণা যুক্ত করা হয়। ফরাশি বিপ্লবোত্তর নিউ রিপাবলিক গির্জার সম্পদ ও সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে। ১৭৯৫ সালে ফ্রান্সকে প্রথম ধর্মনিরপেক্ষ (secular) রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা করা হয় এবং সংবিধান ঘোষণা করে যে 'the state shall not recognize or subsidize any religion (Kuru, 2009: 30)'। তবে ১৮০১ সালের ১৫ জুলাই স্বাক্ষরিত কনকর্ড্যাট (Concordat) অনুযায়ী রোমান ক্যাথলিজম অধিকাংশ ফরাশির ধর্ম হিসেবে স্বীকার করা হয়। একইসাথে ইহুদি ধর্ম, লুথারিয়ান এবং রিফর্ম চার্চকেও রাষ্ট্র স্বীকার করে নেয় (*The Columbia Encyclopaedia*, 2008)। এই চুক্তি ১৯০৫ সাল পর্যন্ত বহাল থাকে। তৃতীয় রিপাবলিকের (Third Republic, 1870-1940) সময় ১৯০৫ সালে ফ্রান্স রাষ্ট্রীয় নীতি হিসেবে ধর্মনিরপেক্ষতা *(Laicite)* গ্রহণ করে এবং ঘোষণা করে যে 'The Republic did not recognize, employ, or subsidize any religion' (Majumder, 2013: 220)। ফ্রান্সের পরবর্তী ১৯৪৬ সাল এবং ১৯৫৮ সালের সংবিধানেও রাষ্ট্রীয় এ নীতি বজায় থাকে। ১৯৫৮ সালের সংবিধানের প্রথম অনুচ্ছেদে ঘোষণা করা হয়েছে, 'France as a secular, democratic and social Republic and ensured the equality of all citizens before the law, irrespective of origin, race or religion (The Pew Forum, 2005)'। এভাবে দীর্ঘ সংগ্রাম ও প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে ফ্রান্স তথা পাশ্চাত্যে ধর্মনিরপেক্ষ ধারণার উদ্ভব ও বিকাশ ঘটে।

প্রাচ্য তথা দক্ষিণ এশিয়ায় ধর্ম বলতে পাশ্চাত্যের মতো শুধু কতকগুলো রীতি ও আদর্শকে বোঝায় না। এখানে ধর্ম বলতে রীতি ও আদর্শের সাথে সাথে একটি দর্শনকেও বোঝায়, যা সকল ধর্মকে সম্মান করে। কাজেই দক্ষিণ এশিয়ায় ধর্ম নিরপেক্ষতা দিয়ে ধর্মের নিষিদ্ধতা না বুঝিয়ে ধর্মীয় বিষয়ে অপক্ষপাতমূলক (Neutrality) আচরণকে বোঝানো হয়। এ প্রসঙ্গে মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর (১৮৬৯-১৯৪৮) বক্তব্য অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। তিনি বলেন:

> If I were a dictator, religion and the State would be separated, I swear by my religion. I will die for it. But it is my personal affair. The State has nothing to do with it. The State should look after the individual's secular welfare, not his religion (*Harizan*, 1946)।

ব্যক্তিগতভাবে ধর্মের প্রতি বিশ্বাসী না হয়েও পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু (১৮৮৯-১৯৬৪)-এ প্রসঙ্গে বলেন:

> A secular state does not, of course, mean that the people should give up their religion. A secular state means a state in which the state protects all religions, but does not favor one at the expense of others and does not itself adopt any religion as the state religion (*The Statesman*, 1951)।

তাত্ত্বিকতদের বিশ্লেষণে জওহরলাল নেহেরুর ধর্মনিরপেক্ষ নীতির চারটি বিশেষ দিক রয়েছে। যথা:

> (i) The separation of religion from political, economic, social, cultural sides of life;
> (ii) treating religion strictly as a personal matter;
> (iii) freedom of religions and religious tolerance;
> (iv) Providing equal opportunities and no discriminations on religious grounds (Chandra, 1994 : 29-30)।

কাজেই দক্ষিণ এশিয়ায় ধর্মনিরপেক্ষ নীতি বলতে ধর্মের সাথে রাষ্ট্রের একটি সমর্থক সম্পর্ক বোঝায়। তবে রাষ্ট্র কোনো বিশেষ ধর্ম সম্প্রদায়ের প্রতি বিশেষ কোনো প্রাধান্য বা বৈষম্য সৃষ্টি করে না এবং রাষ্ট্র কোনো ধর্মকে তার রাষ্ট্র ধর্ম হিসেবে ঘোষণা করে না। দক্ষিণ এশিয়া তথা বিশ্বের অন্যতম গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ভারত ১৯৭৬ সালে তার সংবিধানের ৪২তম সংশোধনীর মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় নীতি হিসেবে ধর্মনিরপেক্ষতাকে সংবিধানে সংযোজন করে, যদিও ১৯৪৯ সালের নভেম্বরে গৃহীত তার প্রথম সংবিধানেও ধর্মনিরপেক্ষতা চর্চার কতকগুলো ধারা সংযোজিত ছিল। বিশেষ করে ভারতীয় সংবিধানের ২২, ২৫-২৮ এবং ৩০ অনুচ্ছেদে ধর্মনিরপেক্ষতা চর্চার সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছিল (The Constitution of India, 2015)।

লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে অর্জিত বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার আলোকে ১৯৭২ সালে গৃহীত প্রথম সংবিধানে রাষ্ট্র পরিচালনার অন্যতম মূল নীতি হিসেবে ধর্মনিরপেক্ষতাকে গ্রহণ করা হয়। স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন জাগে– ধর্মভিত্তিক পাকিস্তান রাষ্ট্র থেকে স্বাধীনতা অর্জনকারী বাংলাদেশ কেন ধর্মনিরপেক্ষতাকে রাষ্ট্রীয় নীতি হিসেবে গ্রহণ করেছে, এর প্রেক্ষাপট কী, বাংলাদেশের

ধর্মনিরপেক্ষতার স্বরূপ কী, এছাড়া বিভিন্ন সময়ে সংবিধান সংশোধন করে ধর্মনিরপেক্ষ নীতি থেকে সরে গিয়ে ধর্মীয় আদর্শ গ্রহণ, দীর্ঘ সামরিক শাসনে রাজনীতিতে ধর্মের ব্যবহার, সর্বোপরি পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতা ও রাষ্ট্রধর্ম একই সাথে স্থান দেয়ার ফলে বর্তমান বাস্তবতায় ধর্মনিরপেক্ষ নীতির গ্রহণযোগ্যতা কী, এ প্রশ্নগুলোর বিশ্লেষণ এ ক্ষেত্রে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক।

প্রাচীন ও মধ্যযুগে বাংলার সমাজ ও রাজনীতিতে ধর্মীয় সহিষ্ণুতার বিষয়টি বেশ জোরালো ছিল। প্রাচীন বাংলার ইতিহাসের প্রথম রাজবংশীয় শাসন ছিল পালযুগ। পালরাজাগণ ছিলেন বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। তবে তাঁরা বাংলার শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব, জৈন প্রভৃতি ধর্মাবলম্বী জনগোষ্ঠীর প্রতি উদার শাসন ও পৃষ্ঠপোষকতা দিয়েছেন। বৌদ্ধ শাসকগণ অন্যান্য ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে অকাতরে ভূমি দান করেছেন (Morrison, 1995)। এছাড়া বৌদ্ধ সম্রাটদের সভাসদ, সভাকবি ও আমত্যবর্গের অনেকে ছিলেন ব্রাহ্মণ্য মতের অনুসারী। এছাড়া পাল শাসকদের মতো দক্ষিণ বাংলার চন্দ্র বংশের শাসকগণও বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ছিলেন। তাঁরাও ব্রাহ্মণদের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। তাঁদের সময়েও ব্রাহ্মণদের নিষ্কর ভূমিদানের অনেক নজির তাম্রশাসনে পাওয়া গেছে (Gupta, 1967: 85-86)। বাংলায় পাল এবং চন্দ্র শাসনের সময় ধর্মীয় সহিষ্ণুতা ও উদারতাকে অনেক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় নীতি হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছিল (আলম, ২০১৯)।

পাল-পরবর্তী সেন শাসকগণ ছিলেন ব্রাহ্মণ্য ধর্মের অনুসারী এবং তাঁরা ছিলেন বৌদ্ধ-বিদ্বেষী। তাঁদের শাসনামলে বৌদ্ধদের প্রতি নির্যাতন এ অঞ্চলে ইসলাম প্রসারের পথ প্রশস্ত করেছিল। মুসলমান শাসনামলে বাংলায় সমগ্র ভূভাগ এক অখণ্ড রাষ্ট্রব্যবস্থার অধীনে আসে। ১৩৩৮-১৫৩৮ সাল পর্যন্ত বাংলার স্বাধীন সুলতানি শাসন বাংলার হাজার বছরের ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ (মুখোপাধ্যায়, ১৯৮৮; Tarafdar, 1998)। এ সময় বাংলার মুসলিম শাসকগণ সামাজিক ও রাজনৈতিক কারণে বাংলার জনগণের মন জয় করতে চেয়েছেন। এক দিকে বাংলার সমাজের উদারনৈতিক ধারা, অন্যদিকে দিল্লির রাজকীয় বাহিনীর আক্রমণের ভয়ে এ সময়ের শাসকগণ ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের ধর্ম ও সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। রাষ্ট্রীয় পদ-পদবি, ভূমি সম্প্রসারণ নীতির বাস্তবায়নে বাংলার মুসলমান শাসকগণ অন্য ধর্মাবলম্বী জনগোষ্ঠীকেও উদার পৃষ্ঠপোষকতা দিয়েছেন (Eaton, 1994)। কাজেই প্রাচীন যুগের মতো মধ্যযুগেও বাংলায় ধর্মীয় সহিষ্ণুতা, সহনশীলতা, উদারতা ও মানবতাবাদ বজায় ছিল। তাছাড়া বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী জনগোষ্ঠীর মিলন-মিশ্রণের মধ্য দিয়ে এ সময় বাংলায় 'সিনক্রোটিক' বা সমন্বয়বাদী ইসলামের ধারাটি খুবই জনপ্রিয় হয়ে ওঠে (Roy, 1983)।

মধ্যযুগের মুঘল শাসনামলেও বাংলার এ উদারনৈতিক ধারা অব্যাহত ছিল। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করার মতো যে বাংলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর একটি বড় অংশ দীর্ঘকাল পর্যন্ত রাষ্ট্র বা রাজ্যের ভাষা, ধর্ম এবং আনুষ্ঠানিক প্রথা-পদ্ধতির আওতা-বহির্ভূত থেকেছে। মুঘল আমলে এ স্বকীয়তা বজায় ছিল। কিন্তু ইউরোপীয়দের বাংলায় আগমনের ফলে তারা ধীরে ধীরে এ সকল প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর দৈনন্দিন জীবনাচার, রীতি-নীতি, বিশ্বাস-অবিশ্বাস, প্রথা-পদ্ধতি এবং অর্থনৈতিক জীবন ধারায় হস্তক্ষেপ করতে শুরু করে। এই সাংস্কৃতিক এবং অর্থনৈতিক সংঘাত থেকে যে দ্বন্দ্বের সূচনা হয়, তার প্রকাশ হিসেবে দেখা দেয় একের পর এক প্রতিরোধ আন্দোলন (হোসেন ও মামুন, ১৯৮৬)। ভারতীয় উপমহাদেশে ইংরেজ শাসনের প্রত্যক্ষ ফল হলো মুসলমানদের অর্থনৈতিক দুরবস্থা। মুসলমানদের কাছ থেকে ইংরেজরা ক্ষমতা নেয়ার ফলে তাদেরকে তারা প্রশাসন, বিচার,

ভূমি প্রশাসনসহ অর্থনৈতিক সকল কর্মকাণ্ড থেকে দূরে রাখে অন্যদিকে এদেশীয় হিন্দু'দেরকে তারা কাছে টেনে নেয়। কিন্তু ভারতীয় প্রথম স্বাধীনতা আন্দোলনের (১৮৫৭) ফলে ইংরেজরা ভারতীয় হিন্দু-মুসলমানের সম্মিলিত শক্তি সম্বন্ধে সচেতন হয় এবং অঘোষিত Divide and Rule Policy চালু করে। এরই ধারাবাহিকতায় বৃটিশ সরকার ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ করে। পূর্ব বাংলার মুসলমানরা অর্থনৈতিক সুবিধা বিবেচনায় বঙ্গভঙ্গকে সমর্থন করে এবং কলকাতাকেন্দ্রিক হিন্দু জনগোষ্ঠী তাদের অর্থনৈতিক লাভ ও জাতীয়তাবাদী প্রেরণায় বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতা করে। ১৯০৬ সালে ঢাকায় নিখিল ভারত মুসলিম লীগ গঠিত হওয়ায় পর থেকে বাংলায় সাম্প্রদায়িক রাজনীতি জোরালো হয়। ১৯৩০-এর দশকে মুসলিম লীগের পক্ষ থেকে ভারতীয় মুসলমানদের সমস্যা সমাধানে মুসলমানদের স্বতন্ত্র আবাসভূমির দাবি করা হয় এবং ১৯৩৩ সালে চৌধুরী রহমত আলী 'PAKISTAN'[২] নামকরণ করেন (Ali, 1933)। এখানে উল্লেখ যে ১৯৩০ সালে স্যার মুহাম্মদ ইকবালের মুসলমানদের স্বতন্ত্র আবাসভূমির প্রস্তাব এবং চৌধুরী রহমত আলীর 'PAKISTAN'-এ পূর্ব বাংলার মুসলমানদের বিবেচনায় নেয়া হয়নি। ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাবে ভারতের উত্তর-পূর্ব (বাংলা ও আসাম) এবং উত্তর-পশ্চিম (বর্তমান পাকিস্তান) অঞ্চলে মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র আবাসভূমি (States) গঠনের প্রস্তাব করা হয় (Allana, G, 1968)। কিন্তু ১৯৪৬ সালে মুসলিম লীগ একক রাষ্ট্র গঠনের প্রস্তাব করলে তার আলোকে ১৯৪৭ সালে ধর্মের উপর ভিত্তি করে ভারত বিভক্ত হয়ে ভারত ও পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টি হয়।

পাকিস্তান আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ তথা তৎকালীন নিখিল ভারত মুসলিম লীগের নেতৃবৃন্দ ছিলেন পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত, উদারনৈতিক। তাঁরা কখনোই ইসলামপন্থী ছিলেন না। তাঁরা দেখেছেন মুসলমানদের সাম্প্রদায়িক স্বার্থ। এতে ধর্মের কোনো ব্যাপার ছিল না, ছিল সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক লাভ। বাংলায় মুসলমানরা এ স্বার্থেই পাকিস্তান আন্দোলনকে সমর্থন করেছেন। মুহম্মদ আলী জিন্নাহ (১৮৭৬-১৯৪৮) এ নীতিরই প্রতিভূ ছিলেন। পাকিস্তান গণপরিষদের উদ্বোধনী বক্তৃতায় (১১ আগস্ট ১৯৪৭) তিনি বলেন:

> you are free; you are free to go to your temples, you are free to go to your mosques or to any other places of worship in this state of Pakistan. You may belong to any religion or caste or creed that has nothing to do with the business of the State (Allana, 1977:172).

কিন্তু পরবর্তীকালে তাঁরা এ নীতিতে স্থির থাকতে পারেননি। পাকিস্তানি শাসকদের অগণতান্ত্রিক মানসিকতা গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি না করে স্বেচ্ছাচারী শাসন বজায় রাখার জন্য ধর্মকে রাজনীতিতে ব্যাপক ব্যবহার করে এবং মুসলমান সাম্প্রদায়িক চেতনা জাগিয়ে রাখতে ভারত বিরোধিতা করে (হক, ২০১৬)।

দুই অংশে বিভক্ত (পূর্ব ও পশ্চিম) অদ্ভূত রাষ্ট্র পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার শুরু থেকেই চালু হয় পূর্বের উপর পশ্চিমের আধিপত্য। আন্তঃরাষ্ট্রিক ঔপনিবেশিক পাকিস্তানে গণতন্ত্রের বদলে প্রতিষ্ঠিত হয় স্বৈরতন্ত্র, অধিকার স্বীকৃতির বদলে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয় শোষণের যন্ত্র হিসেবে (কবির, ২০১৫)। ধর্মের উপর ভিত্তি করে পাকিস্তান সৃষ্টি হলেও ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপারে দু'অঞ্চলের মানুষের মধ্যে পার্থক্য ছিল ব্যাপক। পশ্চিম পাকিস্তানের লোকজন মনে করত যে পূর্ব পাকিস্তানের মুসলমানগণ নিম্নশ্রেণির হিন্দু

থেকে মুসলমান হয়েছে, অন্যদিকে তাদের ইসলাম এসেছে ইসলামের জন্মভূমি আরবদেশ থেকে (কবির, ২০১৪:২)। ফলে পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকবর্গ বাঙালিদের প্রকৃত মুসলমান বানানোর জন্য রাষ্ট্রীয় সংহতির কথা বলে বাংলাকে বাদ দিয়ে উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করতে চেয়েছিল, যার জন্য বাঙালি জনগোষ্ঠী ১৯৪৮-৫২ সালের ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে নতুন বাঙালি জাতিসত্তাকে আবিষ্কার করে এবং পাকিস্তান-রাষ্ট্রচেতনা থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন ভাবতে থাকে। বাঙালির এ ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদ পাকিস্তানি মুসলিম ধর্মীয় জাতীয়তাবাদ থেকে ভিন্ন এবং তা ধর্মনিরপেক্ষ। পাকিস্তানি শাসন পূর্ব বাংলায় সকল ক্ষেত্রে যে বৈষম্যের সৃষ্টি করে, তার বিরুদ্ধে বাঙালির গণতান্ত্রিক সংগ্রামে এই ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদী চেতনা সকল ক্ষেত্রে অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করেছে এবং তা ছিল মুক্তিযুদ্ধেরও অন্যতম চেতনা।

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর মহান মুক্তিযুদ্ধে বিজয়ের মাধ্যমে যে বাংলাদেশের সৃষ্টি হয়, তা সকল ধর্ম সম্প্রদায়ের মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার নিয়েই প্রতিষ্ঠিত হয়। আমাদের স্বাধীনতার আনুষ্ঠানিক ঘোষণাপত্রেও এ প্রত্যয় ব্যক্ত করে বলা হয়েছিল, 'In order to ensure for the people of Bangladesh equality, human dignity and social justice' (রহমান, ১৯৮২:৫)। কাজেই বাংলাদেশ ঐতিহাসিক বাস্তবতা মেনেই ধর্মনিরপেক্ষতাকে রাষ্ট্রীয় আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেছে। তবে বাংলাদেশের এ ধর্মনিরপেক্ষতার স্বরূপ ছিল সকল ধর্ম সম্প্রদায়ের জন্য সমান সুযোগ সৃষ্টি করা, রাজনীতিতে ধর্মের ব্যবহার নিষিদ্ধ করা। বাংলাদেশের ধর্মনিরপেক্ষতার স্বরূপ কী, তা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ সালের ১২ অক্টোবর গণপরিষদে সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন :

> ধর্মনিরপেক্ষতা মানে ধর্মহীনতা নয়, হিন্দুরা তার ধর্ম পালন করবে; মুসলমান তার ধর্ম পালন করবে; খ্রীস্টান, বৌদ্ধ যে যার ধর্ম পালন করবে। কেউ কারও ধর্মে হস্তক্ষেপ করতে পারবে না, বাংলার মানুষ ধর্মের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ চায়না। রাজনৈতিক কারণে ধর্মকে ব্যবহার করা যাবে না। রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য ধর্মকে বাংলার বুকে ব্যবহার করতে দেওয়া হবে না। যদি কেউ ব্যবহার করে, তাহলে বাংলার মানুষ তাকে প্রত্যাখান করবে, এ আমি বিশ্বাস করি। মুসলমানরা তাদের ধর্ম পালন করবে। তাদের বাধা দিবার মতো ক্ষমতা এই রাষ্ট্রের কারো নেই। হিন্দুরা তাদের ধর্ম পালন করবে, তাদের কেউ বাধা দিতে পারবে না। বৌদ্ধরা তাদের ধর্ম পালন করবে, খ্রিস্টানরা তাদের ধর্ম পালন করবে। আমাদের শুধু আপত্তি হলো, ধর্মকে কেউ রাজনৈতিক অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করতে পারবে না। ২৫ বছর আমরা দেখেছি ধর্মের নামে জুয়াচুরি, ধর্মের নামে শোষণ, ধর্মের নামে বেঈমানী খুন, ব্যভিচার বাংলাদেশের মাটিতে চলেছে। ধর্ম অতি পবিত্র জিনিস। পবিত্র ধর্মকে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা চলবে না। যদি কেউ বলে যে ধর্মীয় অধিকার খর্ব করা হয়েছে, আমি বলব, ধর্মীয় অধিকার খর্ব করা হয়নি। সাড়ে সাত কোটি মানুষের ধর্মীয় অধিকার রক্ষার ব্যবস্থা করেছি। (হালিম, ২০১৪: ৭০)।

এ বিষয়গুলোকে ধারণ করে ১৯৭২ সালের সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতাকে শুধু রাষ্ট্রীয় মূলনীতির অন্যতম হিসেবে ঘোষণাই করা হয়নি, তা বাস্তবায়নে কতগুলো দিক নির্দেশনাও দেয়া হয়েছিল। যথা:

(ক) সর্ব প্রকার সাম্প্রদায়িকতা,
(খ) রাষ্ট্র কর্তৃক কোন ধর্মকে রাজনৈতিক মর্যাদা দান,
(গ) রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ধর্মীয় অপব্যবহার,
(ঘ) কোন বিশেষ ধর্মপালনকারী ব্যক্তির প্রতি বৈষম্য বা তাহার উপর নিপীড়ন, - বিলোপ করা হইবে। (গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, ১৯৭২:১২)

বঙ্গবন্ধুর সরকার রাষ্ট্রের অন্যতম মূলনীতি হিসেবে ধর্মনিরপেক্ষ নীতিকে গ্রহণ করে সাংবিধানিক গ্যারান্টি প্রদান করলেও সে নীতি পুরোপুরি বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি। একদিকে দেশীয় ষড়যন্ত্র, রাষ্ট্রীয় নীতি বাস্তবায়নের কৌশলের অভাব, অন্যদিকে নবীন রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক বিরোধের ফলে বঙ্গবন্ধুর সরকারকে পশ্চিম এশিয়ার দেশগুলোর সাথে সম্পর্ক উন্নয়নের লক্ষ্যে এবং অর্থনৈতিক প্রয়োজন বিবেচনায় ১৯৭৪ সালে লাহোরে অনুষ্ঠিত ইসলামি সম্মেলন সংস্থার বৈঠকে যোগদান, ১৯৭৫ সালে ইসলামি ফাউন্ডেশন পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে হয় (কবির, ২০১৯)। কাজেই বঙ্গবন্ধুর সরকারের ধর্মনিরপেক্ষ নীতি বাস্তবায়নের সমালোচনায় আমাদের রাষ্ট্রীয় প্রয়োজন ও বাস্তব অবস্থাও বিবেচনায় নেয়া জরুরি।

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট ইতিহাসের বর্বরোচিত হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমে সপরিবারে বঙ্গবন্ধুকে হত্যার মধ্যদিয়ে বাংলাদেশে শুরু হয় দীর্ঘ সেনাশাসন, রাষ্ট্রকে আবার পাকিস্তানি ধারায় ফিরিয়ে নেয়ার চেষ্টা শুরু হয়। ফলে বঙ্গবন্ধু–প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রীয় মূলনীতিতেও আসে পরিবর্তন। খন্দকার মোশতাকের পর সেনাপ্রধান জিয়াউর রহমান ক্ষমতা গ্রহণ করে আদেশ জারির মাধ্যমে সংবিধানের প্রস্তাবনার পূর্বে "বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম" এবং সংবিধানের ৮ (১) অনুচ্ছেদে রাষ্ট্রীয় মূলনীতিতে 'ধর্মনিরপেক্ষতা-র' স্থলে 'সর্বশক্তিমান আল্লাহতালার উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস' প্রতিস্থাপন করেন। সংবিধানের ২৫ অনুচ্ছেদে মুসলিম দেশসমূহের সাথে সুদৃঢ় সম্পর্ক স্থাপনের ঘোষণাও তিনি দেন। ১৯৭২ সালের সংবিধানে ধর্মভিত্তিক যে রাজনৈতিক দলগুলো নিষিদ্ধ ছিল, জিয়া তাদের রাজনীতি করার সুযোগ করে দেন। সমাজ ও রাজনীতিতে জিয়া সুকৌশলে ধর্মের ব্যবহার করেন। রাষ্ট্রকে ইসলামিকরণের লক্ষ্যে জিয়া ধর্ম মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা করেন। এছাড়া অফিস-আদালতে কোরআন-হাদিসের বাণী টানানো, দুই ইদে জাতীয় পতাকা ও ইদ মোবারক পতাকা টানানো, মুসলমানদের ধর্মীয় উৎসবে বাণী প্রদান, গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানে মোনাজাতের প্রচলন, রেডিও-টিভিতে কোরআন তেলওয়াতের সময় তিনগুণ বৃদ্ধি করেন। এভাবে রাষ্ট্রীয় নীতিতে ধর্মীয় বিষয়গুলোকে গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে তুলে ধরে রাজনীতিতে ধর্মের ব্যবহার গভীর চাতুর্যের সাথে সম্পন্ন করেন। তবে জিয়ার রাজনীতিতে ধর্মের ব্যবহারের মূল উদ্দেশ্য ছিল বাংলাদেশকে ইসলামি রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা নয়, বরং পূর্ববর্তী শাসকের একটি বিপরীত চিত্র মানুষের সামনে উপস্থাপনের মাধ্যমে নিজের রাজনৈতিক অবস্থা সুদৃঢ় করে ক্ষমতায় টিকে থাকা (কবির, ২০১৯)।

জিয়াউর রহমানের পর এরশাদ যখন রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করেন, তিনিও তখন জিয়ার পদাঙ্ক অনুসরণ করে রাজনীতিতে ধর্মের ব্যবহার পূর্বের চেয়েও বৃদ্ধি করেন। তিনি শিক্ষায় প্রথম শ্রেণি থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত 'ইসলাম ধর্ম শিক্ষা' বাধ্যতামূলক করেন, রেডিও-টিভিতে নিয়মিত আযান প্রচারের ব্যবস্থা করেন, মাদ্রাসা শিক্ষাকে পৃষ্ঠপোষকতার মাধ্যমে উৎসাহিত করেন, শুক্রবার সাপ্তাহিক ছুটি ঘোষণা করেন, স্বাধীনতা বিরোধীদের পুর্নবাসন অব্যাহত রাখেন এবং ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক

দলগুলোর প্রভাব বিস্তারের সুযোগ করে দেন। রাজনীতিতে ধর্মের ব্যবহারে এরশাদের সবচেয়ে বড় পদক্ষেপ হলো সংবিধানের অষ্টম সংশোধনীর মাধ্যমে ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম করা। যদিও বলা হয় 'প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রধর্ম হইবে ইসলাম, তবে অন্যান্য ধর্মও প্রজাতন্ত্রে শান্তিতে পালন করা যাইবে। (বাংলাদেশ সংবিধান, ১৯৮৮)'।

১৯৯০ সালে গণআন্দোলনের মাধ্যমে এরশাদের পতন ঘটে। তিন জোটের রূপরেখার ভিত্তিতে গণতন্ত্রের নবযাত্রা শুরু হয়। তবে ১৯৯১ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বাম, ডান, মধ্যপন্থী এবং মৌলবাদীসহ সকল দলই ধর্মকে রাজনীতিতে ব্যবহার করে (Riaz, 2004)। দীর্ঘ সামরিক শাসনে ধর্মের এ ব্যবহারে জনগণ অভ্যস্থ হওয়ায় সব রাজনৈতিক দল সেই সহজ পথেই হাঁটে। বিএনপি জামাত-ই-ইসলামীর সমর্থনে ক্ষমতাসীন হয়। ফলে সামরিক শাসনামলের মতো তারাও রাজনীতিতে ধর্মের ব্যবহার ও ধর্মভিত্তিক দলগুলোকে পৃষ্ঠপোষকতা দান অব্যাহত রাখে। ১৯৯৬ সালে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মাধ্যমে ধর্মনিরপেক্ষ নীতির সমর্থক আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসে। কিন্তু '৭৫-পরবর্তী সময় থেকে সামরিক শাসনে ধর্মের ব্যবহার এবং ধর্মপন্থী দলগুলোর শক্তিবৃদ্ধির কারণে রাজনীতির বাস্তব অবস্থা বিবেচনায় আওয়ামী লীগ ধর্মনিরপেক্ষতার অনেক নীতির সাথে আপোষ করতে বাধ্য হয়।

২০০১ সালের নির্বাচনে বিএনপি ধর্মভিত্তিক দলগুলোর সাথে জোট বেঁধে ক্ষমতাসীন হয়। নির্বাচনোত্তর সংখ্যালঘু নির্যাতন ঘটে, চিহ্নিত যুদ্ধাপরাধীদের[৩] ক্ষমতাসীন হওয়ার মাধ্যমে ধর্মভিত্তিক রাজনীতির ব্যাপক বিস্তার ঘটে এবং এ সময় ধর্মীয় উগ্রপন্থার ব্যাপক প্রসার ঘটে। চার দলীয় জোটের শাসনের সময় রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় ধর্মীয় উগ্রপন্থা ও সন্ত্রাসের বিস্তার ঘটানো হয়। যেগুলোর মধ্যে ২০০৪ সালে ২১ আগস্ট আওয়ামী লীগের জনসভায় গ্রেনেড হামলা, ২০০৫ সালের ২১ আগস্ট ৬৩ জেলায় ৪৫০টি বোমা বিস্ফোরণ, ২০০৪ সালের এপ্রিলে চট্টগ্রামে দশট্রাক অস্ত্র আটক উল্লেখযোগ্য। এগুলো বাংলাদেশে ধর্মনিরপেক্ষ নীতি বাস্তবায়নে বড় আঘাত ছিল (বাছির, ২০১৯)।

২০০৮ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পূর্বে আওয়ামী লীগ তার নির্বাচনী ওয়াদা হিসেবে ১৯৭২ সালের সংবিধান পুনঃপ্রবর্তনের ঘোষণা দেয়। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ যে ২০০৫ সালের ২৯ আগস্ট বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ জিয়াউর রহমানের সময়ের সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনী অবৈধ ঘোষণা করে এবং ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট থেকে ১৯৭৯ সাল পর্যন্ত খন্দকার মোশতাক আহমেদ, আবু সাদাত মোহাম্মদ সায়েম ও জিয়াউর রহমানের সামরিক শাসনকে অবৈধ ঘোষণা করে। এছাড়া ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট থেকে ১৯৯১ সালের নির্বাচন-পূর্ব পর্যন্ত সরকার পরিবর্তন সংবিধান-সম্মতভাবে হয়নি বলে অভিমত ব্যক্ত করে। এ রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করা হলে আপিল আদালত ২৭ মে ২০১১ সালে হাইকোর্টের রায় বহাল রাখে। ফলে হাইকোর্টের রায়ের আলোকে সংবিধান সংশোধন করে ১৯৭২ সালের সংবিধানে ফিরে যাওয়ায় বাধ্যবাধকতা সৃষ্টি হয়। আওয়ামী লীগ সরকার ৩০ জুন ২০১১ তারিখে সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে ১৯৭২ সালের সংবিধানে ফিরে যায়। কিন্তু এক্ষেত্রেও ধর্মনিরপেক্ষ নীতির সাথে আপোষ করে প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম বহাল রাখা হয় এবং সংবিধানের প্রস্তাবনার পূর্বে 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম' অটুট থাকে, তবে রাষ্ট্রধর্মের ব্যাপারে বলা হয়, 'প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম, তবে হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টানসহ অন্যান্য ধর্ম পালনে রাষ্ট্র সমমর্যাদা ও সমঅধিকার নিশ্চিত করিবেন (বাংলাদেশ সংবিধান,

অনুচ্ছেদ ২ক)'। এ সংশোধনীর ফলে বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় মূলনীতি হিসেবে ধর্মনিরপেক্ষতা ফিরে এসেছে সত্য, কিন্তু রাষ্ট্রধর্ম বহাল থাকায় এক দ্বান্দ্বিক অবস্থা বিরাজ করছে।

হাজার বছরের বাঙালী সংস্কৃতিকে ধারণ ও লালন করার লক্ষ্যে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ সালের সংবিধানে রাষ্ট্রপরিচালনার অন্যতম মূলনীতি হিসেবে ধর্মনিরপেক্ষতাকে গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু ধর্মনিরপেক্ষতা ঘোষণার মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা যায় না। এটি হচ্ছে একটি সাংস্কৃতিক আবহ, যা চর্চার মধ্য দিয়ে বাস্তবায়িত হয়। বঙ্গবন্ধুর স্বল্পস্থায়ী শাসনামলে সে চর্চা পুরোপুরি সম্ভব হয়নি। পরবর্তী পর্যায়ে বাংলাদেশের কালো অধ্যায় সামরিক শাসনের যুগে এ চর্চাকে দূরে ফেলে এর বিপরীত অবস্থাকে লালন ও পরিতোষণ করা হয়েছে। ফলে ধর্মাশ্রয়ী রাষ্ট্র পাকিস্তানি মানসিকতা বৃদ্ধি পেয়েছে, ধর্মভিত্তিক দল শক্তিশালী হয়েছে, ভোটের রাজনীতিতে ধর্মের ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে। পরবর্তী সময়ে গণতন্ত্রের পুনঃযাত্রা হলেও গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের দুর্বলতা, রাজনৈতিক দলগুলোর মানসিকতায় অপরিবর্তন, ক্ষমতায় যাওয়ার অদম্য আকাঙ্ক্ষা সর্বোপরি বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলোতে গণতন্ত্রের চর্চাহীনতার কারণে ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতির চর্চা অত্যন্ত সীমিত হয়ে পড়েছে। তবে ১৯৭২ সালের সংবিধানে ফিরে যাওয়ায় যে প্রেক্ষাপট সৃষ্টি হয়েছে, তাতে সংবিধানের সীমাবদ্ধগুলো অতিক্রম করার জন্য গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের মাধ্যমে, রাজনৈতিক দলগুলোতে গণতন্ত্রায়নের মাধ্যমে এবং সুশীল সমাজকে দৃঢ়ভিত্তিক উপর দাঁড় করিয়ে বাঙালি জনগণের মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম চেতনা ধর্মনিরপেক্ষতা বাস্তবায়ন সম্ভব।

টীকা

১. হিন্দু: এ শব্দটি ভৌগোলিক পরিচিতমূলক শব্দ। চর্তুদশ শতাব্দীর আগ পর্যন্ত ভারতীয় উৎসে ধর্ম হিসেবে এ শব্দের ব্যবহার ছিল না। 'সিন্ধু' থেকে এ শব্দের উৎপত্তি। খ্রিষ্টপূর্ব প্রথম সহস্রাব্দের মধ্যভাগে ভারতীয় উত্তর পশ্চিমাঞ্চল যখন পারস্যের অ্যাকেমেনীয় সাম্রাজ্যের অর্ন্তভুক্ত, হয় তখন এ অঞ্চলটি 'গান্ধারা' এবং 'হিন্দ (al-Hind)' নামে পরিচিত ছিল। আধিবাসীদের বলা হতো হিন্দু। পরবর্তীকালে ইন্দো-আর্য সময়ে এটি 'ইন্দো (Indus)' নামে পরিচিত ছিল। চর্তুদশ শতাব্দী পর্যন্ত শব্দটি ভৌগোলিক পরিচিতিমূলকই ছিল এবং এখানকার মুসলিম অধিবাসী ছাড়া আর সবাই হিন্দু নামেই পরিচিত ছিল। পরবর্তীকালে বৃটিশ ঔপনিবেশিক শক্তি ক্রুসেডের মাধ্যমে ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে পরিচিত হয়েছিল, কিন্তু ভারতীয় বিচিত্র ধর্ম সম্প্রদায় সম্পর্কে তাদের জ্ঞান ছিল সীমিত। তারা বৈচিত্র্যপূর্ণ বহু ভারতীয় ধর্মীয় সম্প্রদায়ের ধর্মকে একত্রে 'হিন্দুত্ববাদ (Hinduism)' বলতে থাকে এবং তখন থেকে 'হিন্দু' একটি ধর্মীয় বিশ্বাস হিসেবে পরিচিত হতে থাকে (বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন, (Thapar, 2014)।

২. PAKISTAN : ১৯৩০ সালে আল্লামা ইকবাল মুসলিম লীগের সভাপতির এক ভাষণে বর্তমান পাকিস্তানের সীমারেখা নিয়ে মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র আবাসভূমির দাবি উত্থাপন করেন। সেখানে বর্তমান বাংলাদেশকে বিবেচনায় নেয়া হয়নি। পরবর্তী সময়ে ইকবাল–প্রস্তাবিত এলাকার নামকরণ PAKISTAN করেন চৌধুরী রহমত আলী ও অন্যান্যরা। সেখানেও বাংলাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। এ PAKISTAN হলো: P-Punjab, A-Afghan Province (i.e.The North-West Forntier Province), K-Kashmir, S-Sind, TAN-Baluchistan।

৩. যুদ্ধাপরাধীদের ক্ষমতাসীন করা: ২০০১ সালে চার দলীয় জোট ক্ষমতাসীন হলে জামায়াত-ই-ইসলামীর দু'জন নেতা চিহ্নিত যুদ্ধাপরাধী মতিউর রহমান নিজামী এবং আলী আহসান মোঃ মুজাহিদকে মন্ত্রিত্ব প্রদান করা হয়। পরবর্তী পর্যায়ে যুদ্ধাপরাধ বিচারের জন্য গঠিত আর্ন্তজাতিক যুদ্ধাপরাধ ট্রাইবুনালের বিচারে এ দু'জনকেই মানবতাবিরোধী অপরাধে মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দেয়া এবং তা কার্যকর করা হয়।

গ্রন্থপঞ্জি

আলম, আকসাদুল (২০১৯), "বাংলা অঞ্চলের হাজার বছরের ইতিহাস: বহুত্ববাদ এবং স্বাধীন বাংলাদেশের চার রাষ্ট্রনীতি", *বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইট পত্রিকা*, সাঁইত্রিশতম খণ্ড, পৃ. ১৯৭-২১২.

কবির, মোহাম্মদ হুমায়ুন (২০১৯), "ধর্ম ও রাজনীতি: প্রেক্ষিত বাংলাদেশ", *প্রবন্ধ সংকলন-৪*, ঢাকা: ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, পৃ. ৮১-৯০।

কবির, মোহাম্মদ হুমায়ুন (২০১৫), "ধর্মীয় জাতীয়তাবাদ ও ধর্মনিরপেক্ষতা: প্রেক্ষিত বাংলাদেশ", ইতিহাস, *বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদ পত্রিকা*, আটচল্লিশ বর্ষ, পৃ. ১৪৯-৫৬।

কবির, মোহাম্মদ হুমায়ুন (২০১৪), *ভাষা আন্দোলন ও নারী*, ঢাকা: বাংলা একাডেমি।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার (২০১১), *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান*, ঢাকা: আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার (১৯৮৮), *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান*, ঢাকা: আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার (১৯৭২), *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান*, ঢাকা: আইন ও বিচার মন্ত্রণালয়।

বাছির, আবদুল (২০১৯), "বাংলাদেশের সংকট : প্রসঙ্গ অমীমাংসিত সেকুলারিজম", *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা*, সংখ্যা-৯৯, পৃ. ৯-১৭।

মুখোপাধ্যায়, সুখময় (১৯৮৮), *বাংলায় ইতিহাসের দুশো বছর: স্বাধীন সুলতানদের আমল*, কলিকাতা: ভারতী বুক স্টল।

হক, আবুল কাশেম ফজলুল (২০১৬), *রাজনীতিতে ধর্ম মতাদর্শ ও সংস্কৃতি*, ঢাকা: জাগৃতি প্রকাশনী।

হালিম, মো: আবদুল (সংকলন ও সম্পাদনা) (২০১৪), *বাংলাদেশ গণপরিষদ বিতর্ক*, ঢাকা: সিবিসি ফাউন্ডেশন।

হোসেন, সৈয়দ আনোয়ার এবং মামুন, মুনতাসির (সম্পাদিত) (১৯৮৬), *বাংলাদেশে সশস্ত্র প্রতিরোধ আন্দোলন*, ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি।

রহমান, হাসান হাফিজুর (সম্পাদিত) (১৯৮২), *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র: তৃতীয় খণ্ড*, ঢাকা: গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, তথ্য মন্ত্রণালয়।

Ali, Choudhary Rahmat (1933), *Now or Never: Are we to live or Perish for ever?*, Cambridge: The Pakistan National Movement.

Allana, G (1968), *Pakistan Movement: Historic Documents*, Karachi: Paradise Subscription Agency.

Chandra, Bipin (1994), *Ideology and Politics in Modern India*, New Delhi: Har Anand Publication.

Crowther, Jonathan (edt.) (1995), *Oxford Advanced Learner's Dictionary*, Oxford: Oxford University Press.

Government of India (2015), *The Constitution of India*, New Delhi: Ministry of Law and Justice (Legistative Department).

Gupta, Kamalakanta (1967), *Copper-Plates of Sylhet*, Vol-1 (7^{th}-11^{th} Century AD), Sylhet: Lipika Enterprises Limited.

Harizan, English Weekly (1933-1956) founded by Gandhi, 22, September 1946.

Kuru, Ahmet T.A (2009), *Secularism and state Policies toward Religion: The United Stales, France and Turkey*, Cambridge: Combridge University Press.

Lagasse, Paul et. al, (2008), '*Concordat of 1801*' The Columbia Encyclopedia (Sixth edition), New York: Columbia University Press.

Majumder, Shantanu (2013), "Understanding of Political Secularism in A Comparative Perspective: France, USA, *Turkey and India", Journal of the Asiatic Society of Bangladesh*, Vol.58 (2): 217-237.

Morrison, BM (1970), *Political Centers and Cultural Regions in Early Bengal*, Arizona: the University of Arizona Press.

Riaz, Ali (2004), *God Willing: The Politics of Islamism in Bangladesh*, Lanham, MD: Rowman & Littlefield Publishers.

Roy, Asim (1983), *The Islamic Syncretistic Tradition in Bengal*, Princetion: Princetion University Press.

Tarafdar, MR (1998), *Husain Shali Bengal: A Socio-Political Study*, Dhaka: Dhaka University Press.

The Directorate of Legal and Administrative information (DILA), (2010) "Text with Constitutional" *La Documentation Françoise*, Head office of the France Prime Minister. Available at: https://www2.assemblee-nationale.fr/langues/welcome-to-the-english-website-of-the-french-national-assembly [Accessed on 21 January 2021]

The Pew Forum on Religion and Public life (2005), 100th Annivervsary of Secularism in France, Washington DC: Pew Research Center. Available at: https://www. Pewforum.org/Government/100-Anniversary-of-Secularism-in-France.aspx) [Accessed on 28 January 2021].

Thapar, Romila (2014), *The Past as Present: Forging, Contemporary Identities Through History,* New Delhi: Aleph Book Company.

The Statesman, Kolkata, 7th July, 1951.